ZvBIqv‡bi ¯vaxbZv †VKv‡Z Px‡bi PigcÎ

লিখেছেন হাসান মূর্তাজা

সুপ্ত আগ্নেয়গিরির কথা আমরা জানি। থেমে থেমে লাভা উদ্‌গীরণ করে এ জাতীয় আগ্নেয়গিরি। কখনো নিরীহ। কখনো ভয়ঙ্কর।

চীন-তাইওয়ান সম্পর্ক অনেকটা সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতোই। অর্ধ-শতাব্দীর বেশি সময়ের দ্বন্দ্ব কখনো নীরব, কখনো সরব। তবে ক'দিন আগে যে অগ্নি উদ্‌গীরণ হলো 'লাল ড্রাগনের' মুখ দিয়ে তা শুধু সরবই নয়, দুশ্চিন্তার কারণও বটে। তাইওয়ানের সম্ভাব্য স্বাধীনতা ঘোষণাকে থামাতে বিচ্ছিন্নতাবাদ বিরোধী আইন পাস করেছে চীনা সরকার। বলা হয়েছে, তাইওয়ান যদি বিচ্ছিন্ন হবার ঘোষণা দেয় তবে 'অ-অহিংস পন্থা'য় তার সমাধানের কথা। এক কথায় তাইপের বিরুদ্ধে বেইজিংয়ের যুদ্ধ ঘোষণার লাইসেন্স এই আইন।

বেইজিংয়ের দৃষ্টিতে তাইওয়ান চীনের বখে যাওয়া প্রদেশ। দক্ষিণ চীন সাগরের এই ছোট্ট দ্বীপটির সঙ্গে চীনা মূল ভূ-খন্ডের চোর-পুলিশ সম্পর্কের ইতিহাস অবশ্য অনেক পুরনো। সেই ২৩৯ খ্রিষ্টাব্দে চীনা অভিযাত্রীদের তাইওয়ান আবিষ্কার করার পর থেকেই দ্বীপটি চীনের মূল ভূখন্ডের অন্তর্গত কি না সেই বিতর্ক চলে আসছে। এ কথা সত্য যে, ইতিহাসের একটা দীর্ঘ সময় চীনা শাসকেরা তাইওয়ানের দাবি নিয়ে তেমন মাথা ঘামাননি। মাথা ঘামানো শুরু হয় মূলত উনিশ শতক থেকে। ১৮৯৫ সালে চীন-জাপান যুদ্ধে চীন পরাজিত হলে তাইওয়ানের মালিকানা চলে যায় টোকিওর হাতে। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর হাতে জাপানের পরাজয়ের পর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তাইওয়ানকে তার পুরনো মালিকের হাতে ফিরিয়ে দেয়ার। চীনে সে সময় গৃহযুদ্ধ চলছে চিয়ান কাইশেকের জাতীয়তাবাদী চীন প্রজাতান্ত্রিক সরকারের সঙ্গে মাও সেতুংয়ের লাল ফৌজদের। কাইশেক অবশ্য চীনের বেশির ভাগ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতেন বিধায় যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন তার হাতেই তাইওয়ানকে তুলে দেয়। কিন্তু পরের ক'বছরে পাল্টে যায় পরিস্থিতি। মাও সেতুংয়ের কমিউনিস্ট বাহিনী পিটিয়ে দেশছাড়া করে কাইশেকের সেনাদের।

ZvBIqv‡bi †cwm‡W›U mB weqvb

কাইশেক তার 'কুওমিনতাং সরকারের' লোকজনসহ ১৯৪৯ সালে পালিয়ে তাইওয়ান চলে আসেন। এরপর দীর্ঘ সময় তাইওয়ানের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করেছে 'কাইশেকের 'কুওমিনতাং' পার্টি। যদিও কাইশেকের পিছু পিছু পালিয়ে আসা ১৫ লাখ মানুষ তাইওয়ানের মোট জনগোষ্ঠীর ১৪ শতাংশ।

কাইশেকের পর কুওমিনতাং সরকারের হাল ধরে তার ছেলে চিয়াং চিং-কু। কিন্তু তিনি পিতার মতো উত্তরাধিকারের রাজনীতির পথে পা না বাড়িয়ে প্রবর্তন করেন গণতন্ত্র। এরই পথ ধরে ২০০০ সালের নির্বাচনে প্রথমবারের মতো কুওমিনতাং দলীয় নন এমন একজন তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি চেন শুই বিয়ান। ২০০৪ সালে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন তিনি।

প্রথম দিকে কাইশেকের উদ্দেশ্য ছিল তাইওয়ানে ঘাঁটি গেড়ে লোকজন সংগঠিত করে পুনরায় মূল ভূখন্ডের ক্ষমতা দখল। কালক্রমে সেই লক্ষ্যে ভাটা পড়ে এবং কুওমিনতাংদের উদ্দেশ্য দাঁড়ায় মূল ভূখন্ডের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাওয়া। পক্ষান্তরে নতুন প্রজন্মের নেতা চেন শুই বিয়ান আদর্শগতভাবে তাইওয়ানের স্বাধীনতার পক্ষে। পালিয়ে আসার পরও দীর্ঘদিন কাইশেকের সরকারকেই বৈধ চীনা সরকারের মর্যাদা দিয়ে আসছিল বিশ্ব সম্প্রদায়। এমনকি জাতিসংঘে তারাই চীনের প্রতিনিধিত্ব করতো। কিন্তু ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ তার নীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটায় এবং বেইজিংয়ের সমাজতান্ত্রিক সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। এরপর তাইওয়ানকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদানকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা ৩০-এর নিচে নেমে যায়।

চীন বরাবরই চেষ্টা করেছে তাইওয়ানকে বগলদাবা করতে। কিন্তু তাইওয়ানের নিজস্ব

সংবিধান, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, সর্বোপরি ৪ লাখ সৈন্যের অত্যাধুনিক সেনাবাহিনী থাকায় সরাসরি সামরিক অভিযান চালানো সম্ভব হয়নি। ফলে তাইওয়ানের রাজনৈতিক মর্যাদা এখন পর্যন্ত অনিশ্চিত।

দীর্ঘ কয়েক দশকের হুমকি-ধামকির পর আশির দশকে এসে চীন তাইওয়ানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিককরণের উদ্যোগ নেয়। এ সময় চীনা যে ফর্মুলা পেশ করে তা 'এক দেশ, দুই নীতি' নামে পরিচিত। এই নীতির আওতায় মূল ভূখন্ডের সঙ্গে একীভূত হওয়ার শর্তে তাইওয়ানকে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন দেয়ার প্রস্তাব রাখা হয়। কিন্তু তাইপে এই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। যদিও কুওমিনতাং সরকার এ সময় তাইওয়ানি নাগরিকদের চীন ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় এবং '৯১ সালে চীনা সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নীতি ত্যাগ করে। দু'দেশের মধ্যে বেসরকারি পর্যায়ে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী তাইওয়ান বিপুল বিনিয়োগ করে মূল ভূখন্ডে। বর্তমান চীনে তাইওয়ানের বিনিয়োগের পরিমাণ ৫ হাজার কোটি ডলার। ১০ লাখ তাইওয়ানি ব্যবসায়িক কারণে বসবাস করেন চীনে। অনেকে মনে করেন, নিজের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ভেবে চীন তাইওয়ানে সামরিক অভিযান পরিচালনা থেকে বিরত আছে। বেসরকারি উদ্যোগ সত্ত্বেও সরকারি পর্যায়ে অবশ্য সম্পর্ক বরাবরই শীতল থেকেছে। বিশেষত চীন চেন শুই বিয়ানের সঙ্গে আলোচনায় বসার পূর্বশর্ত হিসেবে 'এক চীন' নীতি মেনে নেয়ার দাবি থেকে সরেনি। অন্যদিকে চেন শুই বিয়ান পাস করেছেন 'গণভোট আইন'। এর আওতায় তিনি স্বাধীনতার প্রশ্নে দেশে গণভোট আয়োজনের অধিকার লাভ করেছেন। জনমত জরিপে এই প্রশ্নে তাইওয়ানবাসীকে দ্বিধাবিভক্ত মনে হলেও দেশটির জনগণ নিজেদের 'চীনা' পরিচয় দিতে মোটেও আগ্রহ প্রকাশ করেনি।

চীন-তাইওয়ান টানাপড়েনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে আমেরিকা। দেশটি তাইপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু এবং মিত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়ে তাইওয়ান-ওয়াশিংটন সম্পর্ক জোরদার হয়েছে। তবে এ সম্পর্ক প্রথম বড় ধাক্কা খায় ১৯৭৯ সালে। এ সময় প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার চীনের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের পদক্ষেপ হিসেবে তাইওয়ানের প্রতি মার্কিন কূটনৈতিক সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন। একই সঙ্গে মার্কিন কংগ্রেস পাস করে 'তাওয়ান সম্পর্ক আইন'। এতে দেশটিকে যাবতীয় যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলা হয়, চীনের যেকোনো আক্রমণ যুক্তরাষ্ট্র 'অত্যন্ত গুরুত্বের' সঙ্গে নেবে। এরপর থেকে তাইপের প্রতি ওয়াশিংটন 'কৌশলগত অনিশ্চয়তা' বজায় রেখেছে তাইওয়ানে অর্থনৈতিক সহায়তা এবং গণতন্ত্রায়নের মাধ্যমে এই অঞ্চলে চীনের প্রভাব খর্ব করার চেষ্টা করে আসছে আমেরিকা।

১৯৯৬ সালে রচিত হয় ওয়াশিংটন-তাইপে সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ বছর চীন তাইওয়ানের প্রথম সরাসরি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালায়। প্রত্যুত্তরে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন তাইওয়ান অন্তরীপে যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করে চীনের প্রতি সতর্ক বার্তা পাঠান। এ সময় যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ায় ভিয়েতনামের পর সবচেয়ে বড় সামরিক মহড়া চালায়।

ব্যাপারটি ওয়াশিংটনকে একটু চিন্তায় ফেলে। অন্যের যুদ্ধ নিজের ঘাড়ে তুলে নেয়াটা কতটা বুদ্ধিমানের হবে এ নিয়ে বিতর্ক ওঠে। দু'বছর পর প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন তিনটি 'না'র প্রতিশ্রুতি দেন- প্রথমত, তাইওয়ানের স্বাধীনতার প্রতি 'না'। দ্বিতীয়ত, দুই চীন নীতির প্রতি 'না'। তৃতীয়ত, যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থায় অন্তর্ভুক্তির জন্য রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব প্রয়োজন সেসব সংস্থায় তাইওয়ানের অন্তর্ভুক্তির প্রতি 'না'।

তবে বুশ ক্ষমতায় এসে পুনরায় যুদ্ধবাজ নীতি নিয়েছেন। চীনকে ঘোষণা করেছেন 'কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বী'। তবে তাইওয়ানের স্বাধীনতার প্রতি এখনো কোনো রকম সমর্থন দেননি। বরং পরিস্থিতি এখন যেমন আছে তেমনটাই থাক- ওয়াশিংটন তাই চায়।

দার্জিলিংয়ে সংকট

বিশ্বের পর্যটকের দুর্নিবার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ভারতের দার্জিলিং আবার অশান্ত হয়ে উঠেছে। দার্জিলিংয়ের পাহাড়িদের নেতা সুভাষ ঘিসিং ওই এলাকা নিয়ে আলাদা রাজ্য গঠনের আন্দোলন ইতিপূর্বে করেছেন। তার এই আন্দোলনে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা নবোদ্যম পেয়েছে। কিন্তু এরপরও সফল হয়নি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃঢ়তায়। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন সিপিআইএম সরকার সুভাষকে কখনো চটাতে চায় না। তবে মাঝেমধ্যে দার্জিলিংয়ে আইজিএমের শরিক দলগুলোর নেতাদের দ্বারা সুভাষকে চাপে রাখে।

সম্প্রতি আবার বাহাস শুরু হয়েছে। দার্জিলিং স্বশাসিত পার্বত্য পরিষদের নির্বাচন শুরু হওয়ার কথা ছিল প্রায় এক বছর আগে। কিন্তু সুভাষ নির্বাচন নিয়ে নানা টালবাহানা শুরু করেন। তার আবদার রাখতে গিয়ে দু'বার পরিষদের মেয়াদ বাড়াতে হয়। সেই বর্ধিত মেয়াদও এ মাসে শেষ হচ্ছে। তাই নতুন নির্বাচিত পরিষদ শপথ গ্রহণের আগে একটি তত্ত্বাবধায়ক পরিষদ মধ্যবর্তী সময়টুকুতে প্রশাসনিক দায় পালন করবে এমন কথা ছিল। কিন্তু ঘিসিং বলেছেন, তিনিই দার্জিলিংয়ের নেতা এবং নতুন নির্বাচন হলেও তিনি জিতবেন। তাই তত্ত্বাবধায়ক পরিষদের দায়িত্ব অন্য কারো হাতে দেয়া চলবে না। তার হাতেই তুলে দিতে হবে।

আসলে পার্বত্য দার্জিলিংয়ের ব্যাপারে সুভাষই যে এখনো শেষ কথা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কার্যত তা মেনে নিয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসনের নেতাও তাকে করা হয়েছে। আসলে ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা দলকে ক্ষমতায় রেখে নির্বাচন করা অগণতান্ত্রিক নয়, যদিও সে নির্বাচন কতটুকু নিরপেক্ষ হবে তা একটি প্রশ্ন। ভারতে লোকসভা বা বিধানসভার ক্ষেত্রেও বিদায়ী শাসকগোষ্ঠী ব্যতীত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু দার্জিলিংয়ের ক্ষেত্রে সমস্যাটি একটু ভিন্ন। এখানে ক্ষমতাসীন সুভাষের দল জিএসএলএফ যথাসময়ে নির্বাচন করতে চায়নি। তারা নানা অজুহাতে নির্বাচন বানচাল করেছে হয়তো পরাজয়ের আশঙ্কায়। কিন্তু দীর্ঘ একটি বছর একটি অনির্বাচিত পরিষদের সর্বেসর্বা হয়ে থেকেছেন। তাকে এসব সুবিধা না দিলে ৯১ দিনের মাথায় পাহাড় অচল করে দেয়ার হুমকি দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্পষ্টতই সেই হুমকির কাছে নতি স্বীকার করলো।

সুভাষ ঘিসিংকে এতোটা ছাড় দিলে অর্থাৎ তার সব শর্ত মেনে নিলেই তিনি যে গণতান্ত্রিক আচরণ করবেন, তার নিশ্চয়তা নেই। পরিষদের ভোটের সময় এলে তিনি কোনো কৌশল করতে পারেন, আগে যা করেছেন। সুভাষকে তোয়াজ করে চলার একটাই যুক্তি, অল্প জনসমর্থন নিয়েও তার সন্ত্রাস সৃষ্টির ক্ষমতা এবং এই ক্ষমতা সম্পর্কে সরকারের শঙ্কা। ভোটের মুখে সুভাষ আবার কোনো অপকৌশল করলে সরকার যে পিছু হটবে না, এমন নিশ্চয়তাও নেই। তিনি ব্ল্যাকমেইলের রাজনীতিতে হাত পাকিয়েছেন। তিনি সোজা পথে চলবেন না, সেটাই তো স্বাভাবিক।

সম্প্রতি দার্জিলিংয়ের সুভাষবিরোধী শক্তিগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এদের মধ্যে সিপিআইএমের শরিক দলগুলোও রয়েছে। সুভাষকে বেশি তোয়াজ করায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতি তারা ক্ষুব্ধ। তারা দাবি করছে, পাহাড়ে সুভাষের প্রভাব আগের মতো নেই। পাহাড়ের মানুষ তাকে চায় না। সরকাই না বুঝে তাকে বেশি ছাড় দিচ্ছে, যা প্রয়োজন নেই। বিশ্লেষকরা বলছেন, এই পাল্টা চাপ সুভাষকেও পশ্চিমবঙ্গের সরকারের সঙ্গে আপস করতে বাধ্য করতে পারে।

জামান আরশাদ